বাংলাদেশের সমস্যাবলী
Problems of Bangladesh

ইউনিট-৫

প্রায় দুই শত বৎসর ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশের অধীনে থাকার পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়। স্বাধীনতার পর একদিকে রাষ্ট্রগঠন অপরদিকে আর্থ-সামাজিক সংকট দূরীকরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অনেকাংশে সফল হলেও সার্বিক উন্নয়ন দীর্ঘ ২৯ বৎসরেও কাঙ্খিত মাত্রায় সাধিত হয় নি। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং জনগণের জীবনযাত্রার নিম্নমান বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এ সব সমস্যা ছাড়াও অসংখ্য সংকট বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতি রুদ্ধ করে রেখেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিকূলতা, জাতীয় অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিশ্ব-ব্যবস্থায় প্রতিকূল অবস্থান আমাদের বস্তুগত সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে আছে। যদিও বিগত দিনগুলোতে জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্যা নিরসনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। ছিটে ফোঁটা যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তার সুবিধা ভোগ করছে জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ। জনগণের বৃহৎ অংশ এখনও ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অসাবধানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বিরাজিত অসংখ্য সমস্যার স্বরুপ সঠিকভাবে নিরুপণ করে তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া অপরিহার্য। তা না হলে এসব ভয়াবহ সমস্যার কারণে জাতীয় অস্তিত্ব ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।

'বাংলাদেশের সমস্যাবলী' শীর্ষক ইউনিটের বিষয়কে আমরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করবঃ

- *পাঠ- ১ জনসংখ্যা সমস্যা ও বাংলাদেশ।*
- *পাঠ- ২ নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়।*
- *পাঠ- ৩ বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও তা দূরীকরণের উপায়।*
- *পাঠ- ৪ বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়।*
- *পাঠ- ৫ বেকারত্ব সমস্যা ও তার সমাধান।*

পাঠ-১ জনসংখ্যা সমস্যা ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ জনসংখ্যা তত্ত্বকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- ◆ বাংলাদেশের জনসংখ্যাজনিত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- ◆ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আলোচনা করতে পারবেন ।

জনসংখ্যা তত্ত্ব ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

জনসংখ্যা একটি দেশে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, আবার সমস্যা হিসেবেও দেখা দিতে পারে। জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহলো কোন দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট উৎপাদিত খাদ্যের তুলনায় বেশি হলেই সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা সমস্যা হলো খাদ্য সরবরাহের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যজনিত সমস্যা। এ ধরনের জনসংখ্যা সমস্যার কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ, বন্যা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় ।

কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কোন দেশের জনসংখ্যা বেশী হলে বেকার সমস্যা দেখা দেবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিু হবে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ম্যালথাসের অভিমত সমর্থন করেন না। তাঁরা জনসংখ্যাকে কেবলমাত্র খাদ্য উৎপাদনের দিক দিয়ে বিবেচনা না করে দেশের সকল সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বলা হয়, কেবল খাদ্য উৎপাদনের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যাকে বিচার না করে দেশের সমস্ত সম্পদের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যার বিচার করা যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বে জনসংখ্যা সমস্যার বিশ্লেষণে জনসংখ্যাকে দেশের সমস্ড় সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্ত প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় নিশ্চিত করতে পারে সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই হলো কাম্য জনসংখ্যা। কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা বেশি হলে সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে দেশে বেকার সমস্যা দেখা দেয় । এতে মাথাপিছু আয় কম হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিু হবে। পক্ষান্তরে, দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম হলে অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় প্রকৃত জনসংখ্যা কম হলে জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ও পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে না। এতেও মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন হবে। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা থেকে বেশি হলে বা কম হলে জনসংখ্যাজনিত সমস্যা দেখা দেবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার। অথচ বাংলাদেশের লোকসংখ্যা (জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট, '৯৮ অনুযায়ী) ১২ কোটি ৪০ লক্ষ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন লোক বাস করছে। বেকারত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগই বেকার অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের কৃষিতে বিরাজ করছে ছদ্ম বেকারত্ব। তাছাড়া বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। তাই তাদের জীবনযাত্রার মানও নিচু। বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা রয়েছে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় । কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেকে এটা প্রমাণ করতে চান যে, বাংলাদেশ এখনও অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ নয়। তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। ভূ-গর্ভস্থ সম্পদসমূহ আহরণ করে সেগুলোর সুষ্ঠ ব্যবহার এখনও নিশ্চিত করা যায় নি। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষি এখনও পশ্চাদপদ রয়েছে, কৃষির

আধুনিকায়ণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিও যথাযথ ব্যবস্থা আজও গৃহীত হয় নি। কৃষির প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকায়ণ ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত করলে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বাড়ানো সম্ভব।

তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছে। এতে স্পষ্ট যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবেই পরিগণিত করা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যাজনিত সমস্যাসমূহ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা রিপোর্ট, '৯৮ অনুযায়ী আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.১০ ভাগ। আশার কথা, সম্প্রতি সরকারি এক তথ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৯-এ নেমে এসেছে বলে জানা যায়। যাহোক, জনসংখ্যার আধিক্যে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কারণে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হল ঃ

খাদ্য সমস্যা ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান গতির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই দেশে খাদ্য খাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে মেটাতে হয়। খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। ফলে উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অনেক সময় খাদ্য আমদানির কাজে লাগাতে হয়। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

কৃষির ওপর চাপ ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের কৃষির ওপর যে চাপ সৃষ্টি করছে তাতে কৃষি উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অর্থনীতির অন্যান্য খাত সম্প্রসারিত না হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কৃষির ওপরই ক্রমশ বাড়ছে। ফলে কৃষি জমি খন্ডিত বিখন্ডিত হয়ে পড়ছে। তাছাড়া মাথাপিছু জমির পরিমাণ যাচ্ছে কমে। এর ফলে কৃষকদের দারিদ্র্য বাড়ছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক দ্রুত ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কৃষির ওপর যে চাপ সৃষ্টি করছে তার ফলে কৃষি উন্নয়ন বাধার সম্মুখীন হয়ে সমগ্র অর্থনীতিকেই নিশ্চলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কৃষির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এর ফলে কৃষি উন্নয়ন বাঁধার সম্মুখীন হয়ে সমস্ত অর্থনীতিকেই নিশ্চলতার দিকে ঠেরে দিচ্ছে।

বেকারত্ব ঃ বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের জন্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে দায়ী। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগই বেকার। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ লোক বেকার রয়েছে। জনসংখ্যা বর্তমান হারে বাড়তে থাকলে বেকার সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত ঃ বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানি করার জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অনেক সময় পাওয়া যায় না। কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানিতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। ফলে আমাদের শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

মূলধন গঠন ব্যাহত ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে মূলধন গঠনের হার কম। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের পরিমাণ হলো মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই মূলধন গঠনের হার বাড়ানো যাচ্ছে না। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। মূলধন গঠনের হার কম বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যাচ্ছে না।

জীবনযাত্রার নিম্নমান ঃ জীবনযাত্রার উপযুক্ত মান বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং পরিচ্ছন্ন বাসস্থান আবশ্যক। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জীবনধারণের মৌলিক উপাদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ (১৯৯৫-৯৬) অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার এই হার ৫৩ দশমিক ১ এবং ৩৫ দশমিক ৬ ভাগ চরম দারিদ্র্যসীমায় রয়েছে। আর পিআইএস-এর হিসাবে পল্লী অঞ্চলে দরিদ্রদের সংখ্যা ৫১ দশমিক ৭ ভাগ। পুষ্টিহীন

লোকের সংখ্যা এখানে শতকরা প্রায় ৭০ জন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের নিম্নগতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ঃ জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ার কারণে আমাদের মৌলিক দ্রব্যসমূহের ওপর ক্রমশ চাপ পড়ছে। চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই দ্রব্যমূল্য সব সময় উর্ধ্বগামী হচ্ছে।

বাসস্থান সমস্যা ঃ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করতে আবাদী জমি ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া বাসস্থানজনিত সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে। এসব সমস্যা ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে পরিবেশ সমস্যা, সুপেয় পানির সরবরাহ এবং যোগাযোগ ও পরিবহন সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে। কাজেই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখনই ঠেকানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জাতীয় জীবনের জন্যে হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে সম্পদের সাথে জনসংখ্যা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। এ কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যা সমস্যার দ্রুত সমাধান অপরিহার্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো-

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিকল্পনার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে মাথাপিছু আয় বাড়ছে না। এমতাবস্থায়, সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে পারলে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান বহুলাংশেই সম্ভব হবে।

জনসংখ্যার পূনর্বন্টন ঃ জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের সর্বত্র একরূপ নয়। বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৭৫০ জন লোক বাস করে। কিন্তু ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকার উর্বরতা, পরিবহন ও যাতায়তের ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বিভিন্ন রূপ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ-১৯৯৮ এর হিসাব অনুযায়ী ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৬৫৭ জন এবং কুমিল-া জেলায় ১২৯০ জন লোক বাস করে। পক্ষান্তরে, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে ১২০ জন ও ৪৭ জন লোক বাস করে। খুলনা বিভাগের জেলাগুলোতেও জনবসতি তুলনামূলকভাবে কম। ঘনবসতিপূর্ণ জেলাসমূহ থেকে কম জনবসতিপূর্ণ জেলায় জনসংখ্যার পূনর্বন্টনের মাধ্যমেও জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান কিছুটা সম্ভব। জনসংখ্যা পুনর্বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ণ করতে পারলে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে।

আন্ড়র্জাতিক স্থানান্তর ঃ জনসংখ্যা আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের মাধ্যমেও জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সম্ভব। পৃথিবীর অনেক দেশে বাংলাদেশ থেকে লোক স্থানান্তর সম্ভব। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহসহ পৃথিবীর অনেক দেশ শ্রমশক্তি আমদানি করতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশ থেকে জনসংখ্যার স্থানান্তর আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চিত করতে পারলে জনসংখ্যা সমস্যার পথ বহুলাংশে সুগম হবে।

আয় পুনর্বন্টন ঃ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে আয় পুনর্বন্টন বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধনীদের ওপর অধিকহারে কর বসিয়ে কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বন্টন করলে দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। তাছাড়া জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের মাধ্যমে অধিক জমির মালিকদের নিকট থেকে উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করলেও সমাজে আয়ের বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে। আয়ের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার গড় মান বৃদ্ধি করলে সেই মান বজায় রাখতে তারা কম সন্তান লাভ করতে চাইবে। এ ভাবে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের দ্বারা জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে জাতীয় আয় বাড়ে এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানও বাড়ে।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এতে জাতীয় আয় বাড়বে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়লে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে উৎসাহী হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এ ভাবে জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও সামাজিক-অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্য কমানো, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রির সহজলভ্যতা, বহু-বিবাহ নিষিদ্ধকরণ এবং ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও তাদেরকে জন্মনিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান সম্ভব।

জনসংখ্যার আধিক্য আসলেই কি সমস্যা? জাপান তার বিশাল জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় শিল্প উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ জাপানের নেই কোন খনিজ সম্পদ বা অফুরন্ত শষ্য ভান্ডার। তথাপি সে তার বিশাল জনসংখ্যাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে। জনসংখ্যা তখনই সমস্যা হবে যখন তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাবে না। আর আমাদের সমস্যাটা হল এটাই।

সারকথাঃ *জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ আছে। ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা সমস্যা হল খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যজনিত সমস্যা। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ শুধু খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে সমস্ত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমস্যাকে বিবেচনা করেছেন। তবে যে কোন বিবেচনাতেই বাংলাদেশে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যাজনিত যে সব সমস্যা বিদ্যমান তা হলঃ খাদ্য সমস্যা, কৃষির উপর চাপ, বেকারত্ব, শিল্পোন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি, মূলধন গঠন ব্যাহত, জীবনযাত্রার নিম্মান, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বাসস্থান সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশের এ সব সমস্যার সমাধান করতে হলে যে সব পদক্ষেপ নেয়া দরকার, তা হল- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসংখ্যার পুনর্বন্টন, আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. কোন্ অর্থনীতিবিদ খাদ্য সরবরাহের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যকে জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন ?

ক. গুণার মিরডাল;

খ. পল সাম্যুয়েলসন;

গ. অর্মত্য সেন;

ঘ. টমাস রবার্ট ম্যালথাস।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ বেকার?

ক. ৪৮ ভাগ;

খ. ২২ ভাগ;

গ. ৩০ ভাগ;

ঘ. ৩৬ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কি বুঝেন ?

২. ম্যালথাসের মতে অতি জনসংখ্যার কারণে কি কি সমস্যা দেখা দেয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে জনসংখ্যা স্ফীতির কারণে কি কি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারে ?

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব হতে পারে তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জরিপ, ১৯৯৮*

২. *আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৯৪, বাংলাদেশ সরকার*

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

পাঠ-২

Measures for Eradication of Illiteracy

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ বাংলাদেশে নিরক্ষরতার স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণ বলতে পারবেন।
- ◆ নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ◆ নিরক্ষরতা দূরীকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতার স্বরূপ

আধুনিককালে নিরক্ষরতা মানুষের জীবনের একটি অভিশাপ। উন্নত বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান করেছে। পক্ষান্ড়রে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় এ সমস্যা অত্যন্ড় প্রকট। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্থায়নে ইসলামাবাদাস্থ মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের ১৯৯৮ সালের দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন শীর্ষক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা ৬২ ভাগ, ভারতের ৪৮ ভাগ, পাকিস্তানের ৬২ ভাগ, নেপালের ৭২ ভাগ, শ্রীলংকার ১০ ভাগ, ভূটানের ৫৮ ভাগ এবং মালদ্বীপের ৭ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। এ সব দেশগুলোতে মহিলাদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার আরো বেশী। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার হার বাংলাদেশে শতকরা ৭৪ ভাগ, ভারতে ৬২ ভাগ, পারিস্ড়ানে ৭৬ ভাগ, নেপালে ৮৬ ভাগ, শ্রীলংকায় ১৩ ভাগ, ভূটানে ৭২ ভাগ এবং মালদ্বীপে ৭ ভাগ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপে স্বাক্ষরতার হার মোটামুটি সন্ড়োষজনক। বালাদেশ, ভারত, পাকিস্ড়ান, নেপাল ও ভূটানের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ড় হতাশাজনক।

গত পঞ্চাশ বছরে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সাক্ষরতার হার সে হারে বাড়েনি। তবে এ সময়ে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর হতে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত Bangladesh Country Paper-এ উলে-খিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্কদের (১৫ বৎসরের উর্দ্ধে) মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ১৯৭৪ সালে ছিল শতকরা ২৫.৮ ভাগ, ১৯৮১ সালে ২৯.২ ভাগ, ১৯৯১ সালে ৩৫.৩ ভাগ এবং ১৯৯৭ সালে ৪৭.৩ ভাগ। অর্থাৎ ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৭ এই ২৩ বৎসরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র ২১.৫% ভাগ। গত পঞ্চাশ বছরে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা, গণ মাধ্যমের বিকাশ, অকৃষিমূলক কাজে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সাক্ষরতার হার বাংলাদেশে সে হারে বাড়েনি, বেড়েছে তার চেয়েও কম হারে। তবে এ সময়কালে নারীদের স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষার হার বেড়েছে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায়। লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৪১ সালে নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল ৭.৯% ভাগ। ১৯৯১ সালে তা ২৫.৪% ভাগে উন্নীত হয়েছে। অথচ পুরুষদের মধ্যে এ হার ১৮.৮% থেকে ৩৮.৯% এ উপনিত হয়েছে। অর্থাৎ গত পঞ্চাশ বছরে পুরুষদের সাক্ষরতার হার বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ, আর মেয়েদের হয়েছে প্রায় তিনগুণ।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমাদের সাক্ষরতার হার ৭২% ভাগ। অথচ লুসাই, বোম প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে এ হার ১৫% ভাগ এবং মুরং ও খুমীদের মধ্যে মাত্র ৫% ভাগ। এ থেকে স্পষ্ট যে, চাকমা উপজাতি শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর। তবে অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার স্বাক্ষরতার নিম্নহার অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

শহরে এবং গ্রামের মধ্যে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ শহরের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখিত স্থানভিত্তিক সাক্ষরতার তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায়, শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার হার ৪৯.৭% ভাগ আর গ্রামের জনসংখ্যার মধ্যে এ হার মাত্র ২৭.৮% ভাগ। এ থেকে স্পষ্ট যে, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষ এবং গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার সাক্ষরতার ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২ সালের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সব লক্ষ্য ও আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হলে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাংলাদেশ অনেকাংশে মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

তবে এক্ষেত্রে আরো উচ্চাভিলাশী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কাজেই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের মধ্যে দিয়েই জাতির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণ

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যা এখনও এতো ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় নীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এ দেশের মানুষ আজো মুক্তি পায় নি। মুলতঃ যেসব কারণকে নিরক্ষরতার জন্য দায়ী করা যায় তা হলো-

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া ও জলবায়ু। এ দেশে অতি সহজে ফসল ফলিয়ে জীবন নির্বাহ করা যায়। সে কারণে সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা আজও চালু আছে। এ ধরনের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। ফলে সনাতন কৃষি নির্ভর অর্থনীতির এদেশে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তাই অনেক মানুষ অনুভব করে নি। এ কারণে নিরক্ষরতাও সহজে দূর হয় নি।

বাংলাদেশ দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশ। বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য এখানে অত্যন্ত প্রকট। ফলে দরিদ্র মানুষের পক্ষে তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া, দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের শিশু সন্তানদের কৃষি কাজে কিংবা সামান্য আয়-উপার্জনের জন্য দিনমজুরী কিংবা অন্য কোন ধরনের কাজে নিয়োজিত করে। ফলে বেঁচে থাকার প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে সেই শিশুর পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না। ফলে সে নিরক্ষর থেকে যায়।

বাংলাদেশের সনাতন কৃষি অর্থনীতি, সামাজিক গতিশীলতার সংকট, ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় অবহেলা, ব্যাপক দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যা প্রকট হয়ে রয়েছে।

প্রাক-ব্রিটিশ যুগে গ্রাম ছিল মূলতঃ স্থবির সমাজ-সংগঠন। সামাজিক গতিশীলতা না থাকায় এবং বর্ণপ্রথা-ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে পেশা নির্ধারিত হতো। ফলে পেশাগত প্রয়োজনে যোগ্যতা অর্জনের কোন অবকাশ ছিল না। এ কারণে তৎকালে শিক্ষা বিস্তার ঘটেনি। ব্রিটিশ আমলে আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ঘটলেও তা ছিল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার ধারাটিই নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ।

শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কিংবা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যেগ প্রয়োজন তার অভাবও এ সমস্যার জন্য-অনেকটা দায়ী। ইউনেস্কোর মতে, জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ বা জাতীয় বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা প্রয়োজন। সেখানে ১৯৮৪-৮৫ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়েছে জাতীয় আয়ের শতকরা ১.৪৮ ভাগ বা জাতীয় বাজেটের ৮.০৪% ভাগ, ১৯৮৫-৮৬ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ১.৩৯ ভাগ বা জাতীয় বাজেটের ৮.০৮% ভাগ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতীয় আয়ের ২.০২% ভাগ বা জাতীয় বাজেটের ৯.৯৪% ভাগ। বর্তমানে শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হচ্ছে জাতীয় আয়ের শতকরা ৩ ভাগ বা জাতীয় বাজেটের ১৭% ভাগ মাত্র। এ থেকে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দ্রুত গতিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়ক নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি নিরক্ষরতা সমস্যার জন্য দায়ী।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যতটুকু সম্প্রসারিত হওয়া দরকার তা হয় নি। এজন্য সাক্ষরতা অর্জনে কিংবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের একটি অংশও সাক্ষরতা অর্জন বা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ছেলে ও মেয়ে, গ্রাম ও শহর, ধনী ও দরিদ্র ইত্যাদি ব্যবধানকে বিবেচনায় এনে গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করা হয় নি। ফলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যও আসে নি। ধর্মীয় গোড়ামী ও সামাজিক কুসংস্কার নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা আজও পর্দা-প্রথার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, বাল্য বিবাহ ইত্যাদিও নারীদেরকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।

এ সব কারণ ছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় না করা, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান, পাঠদান পদ্ধতির ত্রুটি, শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত যুক্তিসঙ্গত না হওয়া, যথার্থ পরিদর্শনের অভাব, শিশু শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিশুদের প্রতি অভিভাবকদের উদাসীনতা ইত্যাদি কারণও শিক্ষা বিস্তারে সংকট সৃষ্টি তথা নিরক্ষরতা সমস্যার জন্য কম-বেশী দায়ী।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সংবিধানে সার্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়। ১৯৭২ সালে গঠিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।

এছাড়া প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও শিক্ষার সম্প্রসারণ হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণশিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর সাথে যুক্ত হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী। কিন্তু এ সব কর্মসূচি সাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুব সফল হয় নি। তবে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এর সাথে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক উৎসাহ ও সহযোগিতা। এ পর্যায়ে সূচনা হয় সবার জন্য শিক্ষা আন্দোলনের। ১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে যথাক্রমে গঠন করা হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ও সবার জন্য শিক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ অর্জনের জন্য ৪টি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল।

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৯৫ শতাংশে উন্নীত করা ;

২. ছাত্রীভর্তির হার শতকরা ৯৪ শতাংশে উন্নীত করা ;

৩. প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৬০ শতাংশ থেকে শতকরা ৩০ ভাগে হ্রাস করা এবং

৪. বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ শতাংশে উন্নীত করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় এই লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে গণশিক্ষা সম্পর্কিত নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে ঃ

-বয়স্ক সাক্ষরতার হার ২০০২ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশে উন্নীত করা ;

-প্রযুক্তি দক্ষতা, উদ্যোক্তা-দক্ষতা ও নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করা ;

-শিক্ষার্থীদের বর্ণসাক্ষরতা, সংখ্যা সাক্ষরতা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সাক্ষরতা বাড়ানো ;

-গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমানো ;

-নব্য সাক্ষরদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা ;

-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সাক্ষরতার বৈষম্য হ্রাস করা ;

উল্লেখিত এসব সরকারী পদক্ষেপ সফল হলে এবং পাশাপাশি বেসরকারী প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হলে বাংলাদেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ

বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা হলো ঃ

জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ অন্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করা ;

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা ;

গরীব শিক্ষার্থীদের পরিবারকে শিক্ষার বিনিময়ে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রদান ;

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অত্যন্ত দরিদ্র তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও ভাতা প্রদান ;

মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিধানের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাল্য বিবাহ বন্ধ করা ;

শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থাকে কার্যকর করা ;

বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষরতার বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলোকে (এন.জি.ও) সক্রিয় করা ;

শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং

গণমাধ্যমকে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।

সারকথাঃ *বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। এর মধ্যে শহরের তুলনায় গ্রামের এবং পুরুষের তুলনায় নারীরেদর মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশী। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেমের অধিকাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশেষ করে ব্যাপক দারিদ্র, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় অবহেলা এর জন্য তবে কিছুকাল ধরে নিরক্ষরতা দ্রুত দূরীকরণের জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক এই উভয় কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরজ্ঞান প্রদানের সেসব প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে তাতে আশা করা যায় বাংলাদেশে এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শীঘ্রই তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হবে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৮তে বাংলাদেশের নিরক্ষরতার শতকরা হার কত ?

ক. ৬২ ভাগ;

খ. ৪৮ ভাগ;

গ. ৩৮ ভাগ;

ঘ. ৫২ ভাগ।

২. ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা কতভাগ বেড়েছে ?

ক. ৩৮.৫ ভাগ;

খ. ১৮.০ ভাগ;

গ. ২১.৫ ভাগ;

ঘ. ২৬.৫ ভাগ।

৩. বাংলাদেশের উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমাদের সাক্ষরতার হার কত?

ক. ৪৫% ভাগ;

খ. ৫০% ভাগ;

গ. ৫৬% ভাগ;

ঘ ৭২% ভাগ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নারী ও পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র উল্লেখ করুন।

২. সবার জন্য শিক্ষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ যে চারটি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশে নিরক্ষরতা সমস্যার কারণসমূহ চিহ্নিত করুন।

২. নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৮*

২. *প্রতিবেদন (১৯৯৭) জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি*

বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও তা দূরীকরণের উপায়

পাঠ-৩

Poverty in Bangladesh and Strategies for Poverty Alleviation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বা ধারণা

দারিদ্র্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দারিদ্র্য বলতে কি বুঝায় তা আমাদের জানা দরকার। দারিদ্র্য পরিস্থিতি যদিও একটি আপেক্ষিক ধারণা, তবুও এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব। অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক মান অনুযায়ী যাদেরকে দারিদ্র্যের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়, অতি অনুন্নত দেশে তাদের অনেকেই দারিদ্র্যের পর্যায়ে বিবেচিত নাও হতে পারে। তবে দারিদ্র্য বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝায়, যেখানে মানুষ তার অপরিহার্য বস্তুগত প্রয়োজন (Essential material requirements) পরিপূরণ করতে পারে না। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজন যথা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা মিটাতে পারেনা, সে পরিস্থিতিকে দারিদ্র্য হিসেবে গণ্য করা হয়। জন কেনেথ গলব্রেথ (John Kenneth Galbraith) তাঁর বিখ্যাত গণ দারিদ্র্যর প্রকৃতি (The Nature of Mass Poverty) নামক গ্রন্থে দারিদ্র্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে, এক রকম দারিদ্র্য আছে যার দুর্ভোগ সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশকেই ভোগ করতে হয়। আবার কোন কোন সমাজে এমন দারিদ্র্য রয়েছে যার দুর্ভোগ প্রায় সকলকেই ভোগ করতে হয়। অবশ্য উক্ত গ্রন্থেই লেখক মূলতঃ গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। গলব্রেথের অভিমত, উন্নয়নশীল দেশসমূহেই গ্রামীণ দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

উন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক মান অনুযায়ী যাদেরকে দারিদ্র্যের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়, অতি অনুন্নত দেশে তাদের অনেকেই দারিদ্র্যের পর্যায়ে বিবেচিত নাও হতে পারে।

বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিস্থিতির আলোকে শহর ও গ্রামের মানুষের মাথাপিছু আয়ের একটি ন্যূনতম মাত্রাকে দারিদ্র্যের সীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রেও মৌলিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতাকে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাদের আয় দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পরিপূরণ করতে পারেনা, তারাই দরিদ্র। অধুনা দারিদ্র্য চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পুষ্টিমান বিশেষ করে ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ এবং বাসস্থানের সুবিধাকে সূচক হিসেবে বিবেচনা হচ্ছে। তবে যেভাবেই দারিদ্র্যকে চিহ্নিত বা সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, দারিদ্র্যের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো অভাবগ্রস্থতা। দরিদ্রমানুষ মানেই অভাবী মানুষ, দরিদ্র দেশ মানেই অভাবগ্রস্থ দেশ।

দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ

দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ নিয়ে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে এবং বিভিন্নজন কারণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তবে সাধারণতঃ দারিদ্র্যের যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয় তা হলো ঃ

একটি সমাজ বা দেশ প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে দরিদ্র হতে পারে। অনুর্বর জমি, খনিজ পদার্থের অভাব কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততার কারণে কোন দেশ অনুন্নত থেকে যেতে পারে এবং সেকারণে সেদেশের জনগণ দরিদ্র হতে পারে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকলেই যে কোন দেশ দরিদ্র্য হবে তা নয়। জাপান, তাইওয়ান, সিংগাপুর, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র নয়। সুদক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে এদেশগুলি দারিদ্র্য নিরসন করেছে। কাজেই, প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে বরং যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্যকে দারিদ্র্যর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন সমৃদ্ধ অঞ্চল হতে যদি উদ্বৃত্ত অপসারিত হয় তাহলে সে অঞ্চল অনুন্নত হয়ে পড়ে এবং ফলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। পল ব্যারণ দেখিয়েছেন, ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ ইংরেজরা শোষণ করেছিল

বলেই বাংলার অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ থেকে সম্পদ অপসারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সম্পদের অসম বন্টণের কারণেও দারিদ্র্য দেখা দেয়। বাংলাদেশ, ভারত, ব্রাজিল এসব দেশে সম্পদের অসম বন্টনের কারণে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য পীড়িত। কিন্তু চীন, কিউবা প্রভৃতি দেশে সম্পদের সুষম বন্টনের কারণে দারিদ্র্যের পরিমাণ অনেক কম। অথচ এদেশগুলোর বস্তুগত উন্নয়নের স্তর প্রায় একই পর্যায়ে।

কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং শাসন প্রক্রিয়ার মানের উপরও দারিদ্র্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং দারিদ্র্যের জন্যে অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক নীতিকে দায়ী করেন। কেননা, এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কৌশলের কারণে কর্ম-উদ্যোগ হ্রাস পেয়েছে যার ফলে উৎপাদনশীলতা কমে গেছে বলে অনেকেরই অভিমত। উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া মানেই ভোগের পরিমাণ সীমিত হওয়া। এর অনিবার্য পরিণতি হল বস্তুগত প্রয়োজন মিটাতে না পারা অর্থাৎ দারিদ্র্য। অবশ্য অনেক সময় শাসন ব্যবস্থার চেয়ে সরকারের যোগ্যতা বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের সততা ও দক্ষতার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের দারিদ্র্য নিরসনের বিষয়টি নির্ভর করে। অদক্ষ ও মাথাভারী প্রশাসন দারিদ্র্য দূরীকরণের পরিবর্তে বরং জাতীয় সম্পদ অপচয় করে অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে।

দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ হিসেবে মৌলিক জাতিগত স্বভাবের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইংরেজরা আইরিশদের চেয়ে এবং জার্মানরা পোলিশদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী। এশিয়াতে চীনা ও জাপানীরা অন্যদের চেয়ে বেশী পরিশ্রমী ও কর্মমুখী। মৌলিক জাতিগত স্বভাবের এ হেরফেরের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধনী-দরিদ্রের তারতম্য ঘটে। আবার আবহাওয়া ও জলবায়ুকেও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ই হান্টিংটন তাঁর 'Civilization and Climate' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মাঝারী ধরনের শীতল আবহাওয়ার মানুষ পরিশ্রমী ও উদ্যমশীল। তাই তারা ধনী। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মমন্ডলের মানুষের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা প্রবল। তাই তারা দরিদ্র।
উৎপাদন কাঠামোর ভিন্নতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনকে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যে সব দেশ কৃষি পণ্য উৎপাদন করে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের সাথে যারা যুক্ত থাকে তারা সাধারণত দরিদ্র এবং শিল্পপণ্য উৎপাদনকারী দেশ, এমন কি শিল্পায়িত দেশের শিল্প-শ্রমিকরাও অপেক্ষাকৃত ধনী। কেননা, আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের দাম কম এবং শিল্প-পণ্যের দাম বেশী। কাজেই কৃষি শ্রমিকের মজুরী শিল্প-শ্রমিকের চেয়ে কম। তাই কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির যে কোন দেশের অধিকাংশ কৃষক সাধারণতঃ দরিদ্র থাকে।
কোন দেশ ও সমাজের দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ পুংখানুপংখভাবে অনুসন্ধান করা হলে অনেক কারণই খুঁজে বের করা সম্ভব। তবে উল্লেখিত কারণগুলোই দারিদ্র্যের জন্য প্রধানত দায়ী।

বাংলাদেশে দারিদ্রের কারণ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ এবং বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য পীড়িত। বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য-পরিস্থিতি বাংলাদেশে অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৬৩-৬৪ সাল হতে শুরু করে ১৯৮১-৮২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার কমতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্যসীমার নীচে। ইসলামাবাদস্থ মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের ১৯৯৮ সালের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬ ভাগ এখনো দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করে। উক্ত রিপোর্টে আরো উলে- খ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ স্বাস্থ্য সেবা পায় না, শিশু পুষ্টিহীনতার হার শতকরা ৬৭ ভাগ, পয়ঃনিস্কাশনের সুবিধা বঞ্চিত ৫২% ভাগ মানুষ। এ ছাড়া বাংলাদেশের শতকরা ৬২ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর এবং শিশু মৃত্যুর হার প্রতি এক হাজারে ১২২ জন।
এ আলোচনায় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এখন আমরা বাংলাদেশের এই ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করবো। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের নেপথ্যে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কিন্তু এ পর্যায়ে আমরা কয়েকটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশ এক সময়ে সম্পদশালী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এ দেশের জনগণের জীবন-মানও ছিল উন্নত। ব্রিটিশরা যখন এ উপমহাদেশে দখল করে তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় সে সময়কার হল্যান্ড, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার মধ্য দিয়ে বাংলার সম্পদ বা উদ্বৃত্ত অপসারিত হয়েছে। ফলে বাংলার পুঁজি বাংলায় বিনিয়োগ হয় নি। একারণে দেশজ প্রযুক্তির দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিল্প-বিপ্লব সংগঠিত হতে পারেনি। বাংলাদেশে যদি শিল্পায়ন হতো তাহলে বাংলাদেশও ইউরোপের মতোই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণ আমাদের সমৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিপর্যস্তই করেছে এবং সৃষ্টি করেছে ব্যাপক দারিদ্র্য।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানী শাসনকালে নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিকায়ন ও গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে নি। কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য কম থাকায় কৃষকের হাতে পর্যাপ্ত পুঁজি সঞ্চিত হতে পারছে না। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ হচ্ছে না। ফলে গ্রামে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষি শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করারও সুযোগ নেই। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানী শাসনকালে নব্য ঔপনিবেশিক শোষনের কারণে বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিকায়ন ও গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারেনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও ভূমি সংস্কার না করায় এবং গ্রামে কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার না করায় অর্থনৈতিক তৎপরতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে নি, তাই গ্রামে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং তাদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগও সৃষ্টি হয় নি। ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে, শিল্পায়নের নিম্নগতি এবং সার্ভিস সেক্টর সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা শহরে এসে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এর ফলে শহুরে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারাও দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে ভুমির পরিমাণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে জনসংখ্যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ফলে অতি জনসংখ্যাজনিত কারণে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ কম। অন্যদিকে, আধুনিক ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারার কারণে কর্মহীনতা দেখা দিয়েছে। ফলে দারিদ্র্যও দূর হচ্ছে না।

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার অভাব রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পুঁজির (State capital) অভাবও এর জন্য অনেকটা দায়ী। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বেসরকারী সাহায্য সংস্থারগুলোর (NGO) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীও দেশব্যাপী বিস্তৃত নয়। ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক লোক উপার্জনহীন রয়ে গেছে এবং দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে কোনভাবে বেঁচে আছে। অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত না করতে পারার কারণেও দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে একদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যদিকে জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত করা সবচেয়ে জরুরী।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। এ দেশে বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির বিপর্যয় লেগেই আছে। এসব বিপর্যয় বিপুল সংখ্যক মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অনেকে নিঃস্ব হয়ে যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক সচ্ছল মানুষও দরিদ্র হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রকৃতির এই প্রতিকূলতাও দারিদ্র্যের একটি কারণ।

বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির। এ জাতীয় আবহাওয়ার মানুষ অনেকটা অলস ও কর্মবিমুখ হয়। আবহাওয়াজনিত জাতিগত স্বভাবও বাংলাদেশের দারিদ্র্যর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এ সব কারণসমূহ ছাড়াও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অদক্ষ আমলাতন্ত্র, অযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ব্যাপক দুর্নীতি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, সম্পদের অসম বন্টন ইত্যাদি বাংলাদেশকে দারিদ্র্যপীড়িত করে রেখেছে। সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও ব্যাপক কর্ম-উদ্যোগ ছাড়া এ দারিদ্র্য নিরসন করা সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যাপক কর্ম-উদ্যোগ।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূর না করতে পারলে দেশ ও সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের কিছু দেশ এবং তাদের জনগণ যেখানে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাস করছে, সেখানে আমাদের

দেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক মানবেতরভাবে জীবন-যাপন করছে। এ ভয়াবহ দারিদ্র্য হয়তো সহজেই দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দারিদ্র্য নিরসন করা অসম্ভবও নয়। এ ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দেশের সম্পদ ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সমস্যা দূর করা দারিদ্র্য মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। কাঙ্খিত জনসংখ্যা নিশ্চিত করে সেই জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হলে দারিদ্র্য নিরসন করা যাবে। কেননা, দক্ষ জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই করতে পারবে।

বাংলাদেশের ব্যাপক গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে ভূমি সংস্কার এবং গ্রামে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণ করা দরকার। কার্যকর ভূমি সংস্কার করে ভূমিহীন দারিদ্র্য শ্রেণীকে জমি দেয়া হলে সেই জমির উপর নির্ভর করে তারা তাদের কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য দূর করতে পারবে। এ ছাড়া, গ্রাম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করলে উদ্বৃত্ত কৃষক এসব সেক্টরে কর্ম সংস্থান করে আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূর করতে পারে।

গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রদের সহজ শর্তে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দেশে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে উঠবে। এর ফলে একদিকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্যদিকে শ্রম-নিয়োগের সুযোগ বাড়বে। এ পদ্ধতিতেও দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব।

জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি করা হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং এর ফরে দারিদ্র দূর হতে পারে।

দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে পারলে বিশেষ করে অধিক হারে শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে মজুরি-শ্রমিক হিসেবে অনেকে চাকুরী পাবে এবং আয়-উপার্জনের মাধ্যমে তারা তাদের দারিদ্র দূর করতে পারবে।

বিভিন্ন বিপর্যয়ে বিপন্ন হয়ে যারা দরিদ্র হয়ে পড়ে তাদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। এছাড়া, শারিরীক ও মানসিক দিক দিয়ে অক্ষম হবার কারণে যারা দরিদ্র হয়ে যায়, তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়-উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে চরম দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করা যায়।

দারিদ্র্য দূর করার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে প্রেরণা। চীনের পরিকল্পনাবিদেরা মনে করেন, কেউ কারো দারিদ্র্য দূর করে দিতে পারে না। দারিদ্র্য নিরসনের পথ দেখিয়ে দিতে পারে মাত্র। আমাদের দেশের জন্যও এ কথা সত্য। আসলে, দারিদ্র্য দূর করার উপযুক্ত পথ দেখিয়ে দিতে পারলে দরিদ্র মানুষ নিজেরাই তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারেন।

উল্লেখিত এসব কারণ ছাড়াও অনুৎপাদনশীলখাতে অধিক ব্যয়, ব্যাপক সামাজিক বৈষম্য, মজুরীর নিহার এবং নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারকথাঃ *যে ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর সামর্থ্য থাকে না, সে পরিস্থিতিকেই 'দারিদ্র্য' বলা হয়। দারিদ্র্য মানেই অভাব, আর অভাব মানেই দারিদ্র্য। কর্মসংস্থানের অভাব, স্বল্প মজুরী, সম্পদহীনতা, কর্মবিমুখতা, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের ফলেই মূলত: দারিদ্র্য দেখা দেয়। বাংলাদেশেও এ সব কারণে জনগণের ব্যাপক অংশ দারিদ্র্যে জর্জরিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, মজুরীর হার বৃদ্ধি, উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করা এবং শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে গড়ে তুললে বাংলাদেশকে ব্যাপক দারিদ্র্য হতে মুক্ত করা সম্ভব।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. গণ দারিদ্র্যের প্রকৃতি গ্রন্থটি কে লিখেছেন ?
ক. স্টিফেন হাওয়ার্ড;
খ. জন কেনেথ গলব্রেথ;
গ. মাহবুবুল হক;
ঘ. এডওয়ার্ড সাঈদ।

২. এশিয়াতে কোন কোন জাতি তুলনামূলকভাবে বেশী পরিশ্রমী ?
ক. ভারতীয় ও নেপালী;
খ. কুয়েতী ও ইয়েমেনী;
গ. মালয়ী ও ফিলিপিনো;
ঘ. চৈনিক ও জাপানী।

৩. মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কতভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করে?
ক. ৪৬ ভাগ;
খ. ৫৪ ভাগ;
গ. ৬০ ভাগ;
ঘ. ৬২ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিন।
২. দারিদ্র্যের সাধারণ কারণ কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক।

সহায়ক গ্রন্থ

১. জন কেনেথ গলাব্রেথ 'গণ দারিদ্র্যের প্রকৃতি'
(অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ ফারুক)

পাঠ-৪

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়

Environmental Pollution in Bangladesh and its Preservation Measures

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবেশ দূষণের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- পরিবেশ দূষণের ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া বলতে পারবেন।
- পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় বা করণীয় আলোচনা করতে পারবেন।

পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণা

গত কয়েক বছর ধরে সারা পৃথিবীতে যে শব্দটি নিয়ে প্রচন্ড উদ্বেগ ও আশংকা এবং প্রচুর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা হলো পরিবেশ। কেননা, বিশ্ব পরিবেশ আজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ, দ্রুত শিল্পায়ন, বন উজাড়, কৃষি জমির সম্প্রসারণ, মরুময়তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ইত্যাদি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ সংকটাপন্ন। তা'ছাড়া গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামন্ডলের সম্ভাব্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশের বর্তমান অবস্থাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। অনুমান করা হচ্ছে যে, এর ফলে বিলুপ্ত হবে অনেক প্রজাতি, খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পাবে, বদ্বীপ এলাকার বিশাল অংশ ডুবে যাবে পানির নীচে। এছাড়া লোনা জলের গ্রাসে কৃষি বিপর্যস্থ হবে, সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিবর্তনে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের প্রকোপ বাড়বে, ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাবে, কোথাও কোথাও মরুময়তা আরো বাড়বে, মৎস্য সম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। মোট কথা বিশ্বকে মোকাবিলা করতে হবে এক দুর্যোগময় পরিস্থিতির।

গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামন্ডলের সম্ভাব্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পরিবেশের বর্তমান অবস্থাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে।

সাধারণভাবে বলা যায় একটি প্রাণীর চারপাশে যা কিছু বিরাজ করে বা যা কিছু থাকার কারণে একটি প্রাণী স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত অবস্থাই হচ্ছে পরিবেশ। আমরা মানুষ। আমাদের চারপাশের গাছ-পালা, বন-জংগল, নদ-নদী, খাল-বিল, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, দালান-কোঠা, পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরের আলোবাতাস এ সব নিয়েই আমাদের পরিবেশ গঠিত। গোটা পরিবেশকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে জৈব পরিবেশ, অন্যটি হচ্ছে জড় পরিবেশ। যাদের প্রাণ আছে তাদের নিয়ে জৈবিক পরিবেশ গঠিত। সব ধরনের উদ্ভিদ এবং মানুষসহ সব ধরনের জীব-জন্তু, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ জৈবিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাপ, আলো, মাটি, পানি, বাতাস, দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা এসবের প্রাণ নেই। এগুলো জড় পরিবেশের অন্তর্গত। জড় পরিবেশকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা চলে। এর একটি হলো প্রকৃতির সৃষ্টি। যেমন- আলো, বাতাস, মাটি, পানি ইত্যাদি। অপর ভাগটি হল মানুষের গড়া। যেমন- দালান-কোঠা, কল-কারখানা ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণের কারণ

একদিকে বিশ্ব পরিবেশ সংকটের দায়ভার, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনুসরণ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো বাংলাদেশেরও একটি 'ধ্বংসাত্বক আবস্থার সুষ্টি করেছে। মূখ্যতঃ অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে এ দেশের মৃত্তিকারথ উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্পসমূহের নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য দ্বারা নদী, ও মুক্ত জলাশয়সমূহ দূষিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে আশঙ্কাজনক গতিতে বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল, মৎস্য প্রজাতি এবং বিভিন্ন প্রকার শস্য-বীজের জৈব-বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিপর্যস্ড় হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিকতা।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় পরিবেশ দূষণের যে অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যায়।

শিল্প-বর্জ্য থেকে পানি দূষণ ঃ বাংলাদেশের প্রধান সম্পদই হল মাটি ও পানি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগের পরিমাণ ৩৬২৩ বর্গমাইল এবং সামুদ্রিক জলভাগের আয়তন ১২ নটিকাল মাইল। এই বিশাল পানি সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন

ও জীবিকা। কিন্তু দিন দিন এই পানি সম্পদ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পানি দূষণ এ অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য নদীতে ফেলার কারণে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক জরীপে জানা যায়, বাংলাদেশের ৪৩৮৬টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৯০৩টি শিল্প কারখানাকে ক্ষতিকর বর্জ্য সরাসরি পানিতে ফেলতে দেখা যায়। ক্ষতিকর শিল্প বর্জ্য পানিতে ফেলার কারণে নদীর পানি দূষিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলো হল: শিল্প বর্জ, কৃষিতে রাসায়ণিক সার ব্যবহার, গার্হস্থ্য বর্জ, যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজনিত বায়ু দূষণ।

কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভূত দূষণঃ বাংলাদেশের কৃষকরা ঐতিহ্যগতভাবে ফসল ফলানোর জন্য জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা ও অজৈব সারের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং অধিক খাদ্য ফলানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য জৈব সারের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশের জমিতে ইউরিয়া, টি এস পি এবং মিউরেট অব পটাশ এই তিন প্রকারের রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গড়ে বছরে বর্তমানে ১০ লাখ টনের মত সার ব্যবহৃত হচ্ছে। এব সার (বিশেষতঃ ইউরিয়া) পানিতে দ্রবীভূত হয়ে নদী ও জলাশয়ে মিশে যায় এবং পানি দূষিত হয়।

গার্হস্থ্য বর্জ্য ও নগরায়ন সৃষ্ট দূষণঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী হওয়ার কারণে অল্প জমিতে অধিক সংখ্যক মানুষকে বসবাস করতে হয়। এর ফলে বিপুল পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করছে। আবার শহর ও নগরগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠার কারণে পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। অধিকন্তু, নগরায়িত জনসংখ্যা ও নগরায়নের হার দুটোই বেড়ে যাচ্ছে। নগরায়ণ দুইভাবে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। প্রথমতঃ, শহরের বাসগৃহ, অফিস, বাণিজ্য কেন্দ্র ও রাস্ড়ায় কংক্রিটের আবরণ দেয়ায় বৃষ্টির পানি মাটিতে প্রবেশ করতে পারে না, ফলে এ মাটি স্বাভাবিক গুণ হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ত, পৌর আবর্জনা (শুধু ঢাকা নগরেই প্রতিদিন ৩০০০ মেট্রিক টন আবর্জনা তৈরী হয়) মাটিকে দূষিত করে।

রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজনিত বায়ু দূষণ ঃ বাংলাদেশের বায়ু কি পরিমাণে দূষিত তার কোন সঠিক ধারণা না থাকলেও বাতাস যে দুষিত হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। অনেক সময় স্প্রে দিয়ে কীটনাশক ছিটানোর সময় তার একটি অংশ বাতাসে মিশে যায়। অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফরাস জাতীয় বিষাক্ত কীটনাশক বাতাসে মিশে গিয়ে বাতাসকে দূষিত করে। অন্যদিকে, দেশের ছোট বড় প্রায় ৩০ হাজার শিল্প কারখানা, দুই লক্ষাধিক যানবাহন, কয়েক হাজার লঞ্চ, ষ্টীমার, কার্গো এবং প্রচুর সংখ্যক পাওয়ার পাম্প ও পাওয়ার টিলারের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বাতাসে দূষিত হচ্ছে। বাতাসে সীসার হার বেশী থাকায় প্রতিবন্ধী শিশু জন্মের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিবেশ দূষণের ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া

উল্লেখিত উৎপাদন ভিত্তিক ও নগরমুখী উন্নয়ন জনিত দূষণ এবং আওতাবহির্ভ ত বিশ্ব পরিবেশ দুষণের সুদূর প্রসারী ফলাফল বাংলাদেশের জন্য যেসব বিপদ ডেকে আনছে তা হলো-

গ্রীণ হাউস প্রভাবে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা অন্ততঃ ২০ সেঃ মিটার বৃদ্ধি পাবে। ২১০০ সাল নাগাদ ১ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে ২২ হাজার ৮ শত বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় জমি (বাংলাদেশের মোট জমির ১৫.৮ ভাগ) পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

বিভিন্ন কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার ফলে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর পরিণতি হয় ভয়াবহ।

সাগরে পানির পরিমাণ বাড়লে এবং বেশী করে উত্তপ্ত হলে সাইক্লোনের পরিমাণ বাড়বে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ইতিহাসের সর্বোচ্চ গতি সম্পন্ন (২২৫ কিলোমিটার) ঝড় বয়ে গেছে। আগামীতে ভয়াবহতা আরো বাড়বে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরো শক্তিশালী হবে। ফলে ঝড় (কাল বৈশাখী ও টর্নেডো) আরো ভয়ঙ্কর রূপে বেশী করে সংঘঠিত হবে।

বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির পরিবর্তন হবে, যার ফলে নদীর প্রবাহেও পরিবর্তন দেখা দেবে। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের মহাপ- াবনের মতো বন্যার আশঙ্কা বাড়বে। লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং প্লাবণের ফলে সুন্দরবনের ৪ লাখ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে। মরুময়তা বেড়ে যাবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল মরুময় হয়ে পড়বে। শুকিয়ে যাবে উত্তরাঞ্চলের খাল-বিল, নদী-নালা।

শীতকালে শীতের প্রকোপ বাড়বে। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়বে আকাশ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে। ফলে নানা ধরণের গাছ-পালা, পশু-পাখী পরিবর্তিত আবহাওয়া খাপ খেতে না পেরে বিলুপ্ত হবে। পরিবেশ দূষণের ফলে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। ফলে মানুষের জীবন সংকটময় হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ দূষণের কারণে আবহাওয়া ও জীবমন্ডলে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার ফলে মানব সভ্যতা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বিভিন্ন কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার ফলে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আসে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। পরিবেশ সংরক্ষণে উন্নত দেশগুলো যে পরিমাণ সম্পদ নিয়োজিত করতে পারে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে নানা কারণে তা সম্ভবপর হয় না। দারিদ্র্য, জনসংখ্যার চাপ এবং সম্পদের অপ্রতুলতা ও অসম বন্টন ব্যবস্থাই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। কিন্তু তারপরেও প্রাণী জগতের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে, মানুষের সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।

পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় বা করণীয়

মানুষ তার বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছে। ফলে বিশ্বের পরিবেশ সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটেছে। তবে পরিবেশের এই অবনতিশীল প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তীব্র হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় নিয়ে আলোকপাত করা যায়। এ ক্ষেত্রে যেসব করণীয় চিহ্নিত করা যায় তা হলো ঃ

- বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প (রাস্তা, বাঁধ, বড় শিল্প) বাস্ড়বায়নের আগে সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে প্রাক-নিরূপন নিশ্চিত করা।
- দেশে সামগ্রিক ভূমি ব্যবহার পরিবেশ সম্মতভাবে সুনিশ্চিত করা।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো এবং তা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
- দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিশেষ করে জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- পরিবেশসম্মত উন্নয়ন ও নগরায়নের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিটি শিল্প-কারখানায় বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কাঠের বিকল্প জ্বালানী আহরণে সচেষ্ট হওয়া এবং ব্যাপক সংখ্যায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সৌরশক্তি বায়ুশক্তি কার্যকরীভাবে ব্যবহার।
- ব্যাপকভাবে গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ করা এবং সামাজিক ও পারিবারিক বনায়নের উপর জোর দেওয়া।
- উপকূলীয় বনরাজির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণসহ উপকূলীয় পরিবেশ কমিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া।
- কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার কমিয়ে যথাসম্ভব জৈবসার ব্যবহার ও জৈবকীট ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং আরো অরণ্য প্রতিষ্ঠা করা।
- যানবাহন থেকে কালো ধোঁয়া নির্গমন ও উচ্চ শব্দযুক্ত হর্ণ ব্যবহার রোধ করা।
- দুই স্ট্রোক-বিশিষ্ট যান নিয়ন্ত্রণ ও সীসা মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- পৌর, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী বর্জ্যের নিরাপদ অপসারণ নিশ্চিত করা।
- পারমানবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণসহ সব ধরনের তেজস্ক্রিয়তার বিস্তার রোধ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা।

সারকথাঃ *সমগ্র বিশ্বেই আজ পরিবেশ সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবেলা করতে গিয়ে কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও ব্যাপক শিল্পায়ন করার ফলে প্রকৃতির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ এবং সর্বোপরি গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ-বিপর্যয়ের ফলে মরুময়তা বৃদ্ধি পাবার এবং উপকূল অঞ্চল সাগরের নিচে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বনরাজির পরিমাণ বৃদ্ধি উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় রূপরেখা প্রণয়ন এবং কালো ধোঁয়া ও শিল্প বর্জ্য নিয়ন্ত্রনের পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নির্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. আবহাওয়া মন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত পরিবেশ বিপর্যয়কে কি বলে অভিহিত করা হয় ?
ক. এস.ও.এস
খ. মে ডে সিপন্যাল;
গ. কার্বন-ডাই-অক্সাইড;
ঘ. গ্রিণ হাউস প্রতিক্রিয়া।

২. বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলভাগের আয়তন কত ?
ক. ১৬ নটিকাল মাইল;
খ. ১২ নটিকাল মাইল;
গ. ২০ নটিকাল মাইল;
ঘ. ১৮ নটিকাল মাইল।

৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগের পরিমাণ কত?
ক. ২২০০ বর্গমাইল।
খ. ৩২০৫ বর্গমাইল।
গ. ৩৬২৩ বর্গমাইল।
ঘ. ৪১২০ বর্গমাইল।

৪. ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কত অংশ তলিয়ে যাবে?
ক. ১০ হাজার ২শত বর্গ কিলোমিটার ;
খ. ২২ হাজার ৮শত বর্গ কিলোমিটার;
গ. ৩১ হাজার ৫শত বর্গ কিলোমিটার;
ঘ. ৩৮ হাজার ১শত বর্গ কিলোমিটার।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. জৈব ও জড় পরিবেশ বলতে কি বুঝায়?
২. বিশ্ব পরিবেশ দূষণের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. পরিবেশ দূষণের কারণসমুহ বর্ণণা করুন।
২. পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় কি কি?

উত্তরমালাঃ ১. ঘ, ২. খ, ৩. গ, ৪. খ।

সহায়ক গ্রন্থ
১. আলী আহমদ জিয়াউদ্দীন ও হাবিবুর রহমান, প্রকৃতি, পরিবেশ ও সভ্যতার সংকট?
২. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পরিবেশ প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের পরিবেশ?

পাঠ-৫

বেকার সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান

Unemployment Problem and its Possible Solutions

উদ্দেশ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ বেকারত্বের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ◆ বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ বা শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ বলতে পারবেন।
- ◆ বাংলাদেশে বেকারত্ব নিরসণের উপায় নিরূপণ করতে পারবেন।

বেকারত্বের ধারণা

অর্থশাস্ত্রে বেকারত্ব বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝায় যেখানে শ্রমিক কর্মদক্ষ ও বর্তমান মজুরীতে কর্মে যোগদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও কর্ম নিয়োগ লাভ করে না। বেকারত্ব অনেক সময় ইচ্ছাকৃত হতে পারে। যেমন, অনেক কর্মবিমুখ ধনীর সন্তান আছে যারা পিতৃপুরুষের উপার্জিত সম্পদের মাধ্যমেই জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের কাজ করবার ইচ্ছাও নেই, প্রয়োজনও নেই। আবার এক শ্রেণীর লোক আছে যারা সাম্প্রতিক মজুরির হার কম বলে কাজ গ্রহণ করে না। তবে এ ধরনের বেকারত্ব খুব একটা দেখা যায় না।

বেকারত্বের প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন কর্মক্ষম সুস্থ ব্যক্তি, যার কাজ করবার বয়স হয়েছে এবং কাজ করবার ইচ্ছাও আছে অথচ প্রচলিত মজুরির হারে কোন চাকরি পায় না।

বেকারত্বের প্রকৃত সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন কর্মক্ষম সুস্থ ব্যক্তি , যার কাজ করবার বয়স হয়েছে এবং কাজ করবার ইচ্ছাও আছে অথচ প্রচলিত মজুরির হারে কোন চাকরি পায় না। এই ধরনের বেকারত্বেকে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলে। অর্থশাস্ত্র বেকারত্ব বলতে এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকে বুঝায়।

অর্থনীতিবিদ জে.এম.কেইনস এবং সাম্প্রতিককালের কতিপয় লেখক বেকারত্ব বলতে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বুঝিয়ে থাকেন। অধ্যাপক পিগু মত প্রকাশ করেছেন যে, যখন কোন দেশে কর্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতানুযায়ী কাজ পায়না তখন সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।

বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ বা শ্রেণীবিভাগ

বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ বা শ্রেণী মূলতঃ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের রূপ বা শ্রেণীবিভাগকেই নির্দেশ করে। এ বেকারত্বের শ্রেণীবিভাগ এবং এগুলোর পশ্চাতে যেসব কারণ বিরাজমান সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

মৌসুমী বেকারত্ব ঃ এমন অনেক কর্মক্ষেত্র আছে যেখানে সারা বছর কাজ হয় না, যেমন-কৃষি, চিনিশিল্প প্রভৃতি। কৃষকেরা কয়েক মাস কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে, অন্য সময় তাদের কোন কাজ থাকে না। চিনি শিল্পের শ্রমিকগণ বছরে মাত্র কয়েক মাস কাজ করতে পারে। আখের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে তাদের কোন কাজ থাকে না। এভাবে মৌসুম বা ঋতু পরিবর্তনের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয় তাকে মৌসুমী বেকারত্ব বলে।

কাঠামোগত বেকারত্ব ঃ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পায় পুঁজির পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। ফলে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে এই বর্ধিত জনসংখ্যাকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। কেননা, উৎপাদনের উপকরণ ব্যতীত কারো পক্ষে কিছু উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ, বর্ধিত জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বেকারত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সংঘাতজনিত বেকারত্ব ঃ শ্রম সচলতার অভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, শ্রমিক সংগঠনের ধর্মঘট, যন্ত্রপাতির সাময়িক ত্রুটি বা বিকল কাঁচামালের সাময়িক অভাব প্রভৃতি কারণে শ্রমিকেরা যদি সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়ে তবে তাকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে। এই ধরনের বেকার সমস্যা নিতান্তই সাময়িক এবং উন্নত বা অনুন্নত সকল দেশেই এরূপ সংঘাতজনিত বেকার সমস্যা অল্পবিস্তর দেখা যায়।

প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ঃ যখন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কর্মচারী নিয়োজিত থাকে তখন এ অতিরিক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকারত্বের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কৃষির কথা বলা চলে। এখানকার কৃষিক্ষেত্রে যত শ্রমিকের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছে। কাজেই এসব অতিরিক্ত শ্রমিকদের কৃষিক্ষেত্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা আবশ্যক। এ স্থানান্তর সত্ত্বেও কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাবে না কারণ তারা ছিল অতিরিক্ত। এ ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ।

বাণিজ্য-চক্রজনিত বেকারত্ব ঃ বাণিজ্য-চক্র পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে কখনো তেজীভাব আবার কখনও মন্দভোব বিরাজ করে। এ ধরনের তেজী-মন্দার প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল গিয়ে পড়ে কর্ম ও নিয়োগের উপর। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যাও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ফলে সৃষ্টি হয় বেকার সমস্যার।

ন্যূনতম মজুরিজনিত বেকারত্ব ঃ যখন শ্রমের যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি হয় এবং মজুরির হার হ্রাস পায় না তখনই ন্যূনতম মজুরিজনিত বেকারত্ব দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন একটা অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। তখন ন্যূনতম হারে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করতে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছুক ছিল না। এমতাবস্থায় মজুরির হার হ্রাস করলেই কেবল নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারত। কিন্তু তখন মজুরির হার হ্রাস পায় নি বলে অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল।

কার্যকরী চাহিদার অভাবজনিত বেকারত্ব ঃ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় আয়ের একটি অংশ সঞ্চিত থাকে; বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিমাণ থাকে অপেক্ষাকৃত কম। ফলে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং মূল্যস্তরও কমে যায়। এতে লাভের পরিমাণও কমে যায় আর সে সঙ্গে নিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়। এর অব্যবহিত ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় বেকারত্বের ।

যন্ত্রজনিত বেকারত্ব ঃ সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আবিস্কৃত হয় এবং এর ফলে উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঘটে এক ব্যাপক পরিবর্তন। এতে অনেক শ্রমিককে নতুন নতুন কৌশল না জানার কারণে কর্ম থেকে বিদায় নিতে হয়। এভাবে তারা হয়ে পড়ে বেকার। ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ- বকালে বিভিন্ন কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ফ্যাক্টরীতে সনাতন যন্ত্রপাতির স্থলে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিক বেকারে পরিণত হয়। এ ধরনের বেকারত্বকে বলা হয় যান্ত্রিক বেকারত্ব।

বাংলাদেশে উপরে বর্ণিত বেকারত্বের সবগুলো রূপই পরিলক্ষিত হয়। এখানে যে বেকারত্ব অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত আমাদের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বতে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৬% মানুষ বেকার অবস্থায় রয়েছে। এ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের বেকার সমস্যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণসমূহ উল্লেখ করা হল।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৬% মানুষ বেকার অবস্থায় রয়েছে।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের সমস্যার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মের সুযোগ তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ফলে কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সংখ্যা। শিল্প, কল-কারখানায় কাজ লাভের উদ্দেশ্যে পল্লী এলাকার জনগণ এসে ভিড় জমায় শহরাঞ্চলগুলোতে, কিন্তু কারিগরি ও যন্ত্রপাতি চালনার জ্ঞানের অভাবে তারা শিল্প কারখানায় কোন কাজ লাভে সক্ষম হয় না। ফলে তারা বেকারই থেকে যাচ্ছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশঃ বাংলাদেশের সনাতন সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে জনসাধারণ অনেকাংশ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, নারীদের পর্দা প্রথা, বর্ণ প্রথা প্রভৃতি উপাদান আমাদের জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের পশ্চাতে কাজ করে। এসব সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় সব শ্রমিক সব রকম কাজ করতে পারে না।

বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধার কারণে নারী সমাজ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারে না।

কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ঃ আমাদের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে পল্লীর জনগোষ্ঠী কৃষি কাজের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল বলে তারা অতি সহজেই বেকার হয়ে পড়ে। কারণ কৃষি তাদেরকে বছরের কয়েক মাস মাত্র কাজ দিতে পারে। কৃষি মৌসুমেই কৃষকরা কর্ম ব্যস্ড় এবং অন্য সময় তাদের হাতে তেমন কোন কাজ থাকে না বললেই চলে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে, আমাদের দেশের কৃষকরা মৌসুমী বেকারত্বের অন্তর্ভুক্ত।

শিল্পে পশ্চাৎপদতা ঃ শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা বাংলাদেশে বেকারত্বের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ বলে বিবেচিত। বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা কর্মসংস্থানের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি বলে কর্মসংস্থানের তেমন প্রসার ঘটেনি।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এ দেশের বেকার সমস্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী কর্মচারী ও কেরানী সৃষ্টি করা ছাড়া অন্যভাবে বাস্তব উপযোগী কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটছে না সে পরিমাণে। ফলে অনেক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক বেকার হয়ে পড়ছে।

কারিগরি জ্ঞানের অভাব ঃ বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণে। সে সঙ্গে আজকাল ক্ষেত-খামারেও প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ কৃষকই যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিতান্তই অজ্ঞ। ফলে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে এবং অপর দিকে কৃষিক্ষেত্রে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিয়োগের সীমাবদ্ধ সুযোগ ঃ বাংলাদেশে বেকারত্বের জন্য নিয়োগের সীমাবদ্ধ সুযোগ বিশেষভাবে দায়ী। এখানে শুধু কৃষিতেই নয় অকৃষি-খাতেও জনগণকে নিয়োগ করার সুযোগ অতিশয় সীমিত। ফলে বেকারত্ব সংকট বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশে বেকারত্ব নিরসনের উপায়

বাংলাদেশে বেকারত্ব নিরসনের কোন সহজ পথ নেই। এ সমস্যার সমাধান জরুরি হলেও সময়সাপেক্ষ। তবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বেকারত্ব নিরসন সম্ভব। এক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ নেয়া যায় তা হলো ঃ

বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনের কোন সহজ পথ নেই। এ সমস্যার সমাধান সময় সাপেক্ষ, কিন্তু উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বেকারত্ব নিরসন করা সম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রোধ করার মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রোধ করা। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে স্বভাবতই উক্ত জনসংখ্যার একাংশ বেকার থেকে যাবে। কাজেই জনসংখ্যার হার কমিয়ে সম্পদের সঙ্গে তার সমতা আনয়ন করতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূর করা সম্ভব। দেশে এখনো যেসব সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ। কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি সার্ভিস সেক্টর সম্প্রসারণ করেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

কর্ম বিনিময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঃ বেকার সমস্যার জন্য আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্ম বিনিময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এসব প্রতিষ্ঠান বেকার শ্রমিক ও অপূর্ণ কর্মস্থলের বিবরণ সংগ্রহ করে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার মাধ্যমে বেকার জনগণকে তথ্যাদি প্রদান করতে পারে। ফলে শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার গুরুত্বও কম নয়।

কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশের কৃষি অনুন্নত বিধায় দেশের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থান করতে পারছে না । বিনিয়োগের অভাবে কৃষিখাতের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সেচ সুবিধার আওতা বাড়িয়ে এবং জৈব-রাসায়নিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করে দু'ফসল বা তিন ফসল উৎপাদন দ্বারা কৃষিখাতে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেতে পারে।

দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে ঃ শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন অধিক মাত্রায় শিল্প কল-কারখানা স্থাপন। শ্রমঘন শিল্পের পাশাপাশি কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। কুটির শিল্পে অধিক পরিমাণে লোক নিয়োগ করা সম্ভব। এতে করে বেকারত্ব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা ; কোন প্রকার পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা নয়। কিন্তু পেশাগত ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে উঠছে না। কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হলে বেকারত্বও কমবে।

প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশের বেকার সমস্যার দূরীকরণের জন্য প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, এগুলোর কুফল আমাদের জনগোষ্ঠীকে কর্মবিমুখ করে তোলে। ফলে আমাদের শ্রমশক্তির এক উলে- খযোগ্য অংশ বেকার থেকে যায়। এসব প্রথার মধ্যে রয়েছে বর্ণ প্রথা, রক্ষণশীলতা, পর্দা প্রথা এবং বিভিন্ন ধরনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি। এসব দূর করে জনগণের মধ্যে কর্মমুখী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্ড়রের মাধ্যমেঃ বাংলাদেশের বিপুল অদক্ষ জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হলে জনসংখ্যা দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠতে পারে। এছাড়া, দক্ষ জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জনসংখ্যার চাপ একদিকে কমবে, অপরদিকে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

সারকথাঃ *কর্মদক্ষতা থাকা এবং বিদ্যমান মজুরীতে কর্মে যোগদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও কাজ না পাওয়াকে বেকারত্ব বলা হয়। বেকারত্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে, যেমন-মৌসুমী বেকারত্ব, কাঠামোগত বেকারত্ব, সংঘাতজনিত বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, বাণিজ্য-চক্র জনিত বেকারত্ব, ন্যূনতম মজুরীজনিত বেকারত্ব, কার্যকরী বেকারত্ব। বাংলাদেশে সব ধরনের বেকারত্বেরই অস্ড়িত্ব আছে। বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণও বহুবিধ। যেমন-দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ, কৃষির উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতা, শিল্পে পশ্চাৎপদতা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিগরী জ্ঞাণের অভাব ও নিয়োগের সীমিত সুযোগ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি রোধ করার মাধ্যমে, কর্মবিনিময় কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে, কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে, শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এবং সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. কর্মক্ষম এবং কর্ম-আগ্রহী ব্যক্তি প্রচলিত মজুরীর হারে চাকুরী না পেলে তাকে কি ধরনের বেকারত্ব বলে ?

ক. অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব;
খ. মৌসুমী বেকারত্ব;
গ. ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব;
ঘ. যন্ত্রজনিত বেকারত্ব;

২. দ্রুত বেকারত্ব নিরসন করতে হলে বাংলাদেশে কি ধরনের শিল্প গড়ে তোলা বেশী প্রয়োজন ?

ক. পূঁজিঘন শিল্প;
খ. শ্রমঘন শিল্প;
গ. রাসায়নিক শিল্প;
ঘ. বিমান-নির্মান শিল্প।

৩. বাণিজ্য চক্র কোন ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য?

ক. সামন্তবাদী ব্যবস্থার;
খ. সমাজবাদী ব্যবস্থার;
গ. আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার;
ঘ. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বেকারত্বের সংজ্ঞা দিন।
২. বেকারত্ব কত প্রকার ও কি কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তরমালাঃ ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

Bangladesh Statistical Yearbook, ১৯৯৭